ATHENA, VOLUME VIII, JULY 2024 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 178-185
www.athenajournalcbm.in

রতন ভট্টাচার্যের *নগ্ন বসন্ত* ও *কৃষ্ণকীর্তন:* দুই নারীর নিঃসঙ্গতার আখ্যান

বর্ণালী পাল*

প্রাপ্ত: ২৮.০২.২০২৪ পরিমার্জন: ০৬.০৫.২০২৪ গৃহীত: ২১.০৬.২০২৪

সারসংক্ষেপ: *বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে ছোটগল্পের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য জগতে পদার্পণ করেছিলেন রতন ভট্টাচার্য। কিন্তু তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প কোনটি, তা নিয়ে মতভেদ থাকায় সেই সংশয় নিরসনের মধ্য দিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেছি আমরা। এখানে উল্লেখ্য, রতন ভট্টাচার্য ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত সাহিত্য সৃষ্টির কাজে ব্যাপৃত থাকলেও, তাঁর এই সাহিত্য চর্চা নিরবচ্ছিন্ন বা ধারাবাহিক ছিল না। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল অবধি রতন ভট্টাচার্য উনিশটি ছোটগল্প লেখার পর, প্রায় পনেরো বছরের জন্য লেখালেখি থেকে সরে এসেছিলেন। পনেরো বছর পর অবশ্য ১৯৭৮ সালে 'তৃতীয় মহাযুদ্ধ' ('দেশ', ২০ মে ১৯৭৮) গল্পের মধ্য দিয়ে লেখার জগতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তিনি। তবে লেখালেখি থেকে প্রায় পনেরো বছরের বিরতির ফলে রতন ভট্টাচার্যের সাহিত্য জীবনে স্পষ্ট দুটি পর্ব (প্রথম পর্ব: ১৯৫৭-১৯৬৩ এবং দ্বিতীয় পর্ব: ১৯৭৮-১৯৯৯) লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে রতনের প্রথম পর্বের দুটি গল্প 'নগ্ন বসন্ত' ('পরিচয়', ১৯৫৭) এবং 'কৃষ্ণকীর্তন' ('দেশ', ২০ জানুয়ারি ১৯৬১)-এর দুই নারী চরিত্র যথাক্রমে মাধবী এবং রানী বৌদির নিঃসঙ্গ জীবনালেখ্য আমাদের বক্ষ্যমাণ আলোচনার বিষয়।*

সূচক শব্দ: *রতন ভট্টাচার্য, নিঃসঙ্গতা, সমাজ-সংস্কার, অতৃপ্তি, পরকীয়া প্রেম, একাকিত্ব, কামনার অচরিতার্থতা।*

---

*পিএইচ. ডি. গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ।
e-mail: pal.barnali0015@gmail.com

১৯৫৮ সালের ১৯ এপ্রিল সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় 'পিঞ্জর' গল্প প্রকাশিত হলে গল্পকারকে ঘিরে পাঠক এমনকী লেখকমহলে তৈরি হয় এক 'অভূতপূর্ব কৌতূহল'[১]। প্রাসঙ্গিক একটি স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, "একদিন সন্ধে ৭টা নাগাদ কৃত্তিবাসের শংকর চট্টোপাধ্যায় সঙ্গে আরও কয়েকজন কবি লেখকের দলবল নিয়ে 'পিঞ্জর'-এর লেখকের খোঁজে ছোড়দার চায়ের দোকানে এসে হাজির হল কলকাতা থেকে। হইহই ব্যাপার।"[২] এছাড়াও 'পিঞ্জর' গল্প সম্পর্কে বিমল কর তাঁর 'আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা' গ্রন্থে বলেছেন, 'বড়ো সুন্দর লেখা। এখনও আবছাভাবে যেন রেলস্টেশনের সেই জালঢাকা দরজাঅলা রিফ্রেসমেন্ট রুমের ছবিটা মনে পড়ে, মনে পড়ে কাজল বলে একটি মেয়েকে।'[৩] এখানে বিশেষভাবে বলবার, 'পিঞ্জর' গল্প প্রকাশের প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ বছর পরে বিমল কর এই গল্প নিয়ে পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্য করেছিলেন। বিমল করের মতো একজন শক্তিশালী এবং প্রথিতযশা লেখক যখন কোনও গল্প প্রকাশের দীর্ঘ সময় পরও সেই গল্পকে মনে রেখে তার উল্লেখ করেন নিজের স্মৃতিকথায়, তখন আর সংশয় থাকে না সেই গল্পকারের প্রতিভা সম্পর্কে। তাৎক্ষণিক এবং পরবর্তী সময়েও সাড়া ফেলা গল্প 'পিঞ্জর'-এর লেখকের নাম রতন ভট্টাচার্য (২০ জুলাই ১৯৩৩-২২ সেপ্টেম্বর ২০০৬)।

দেশভাগের পটভূমিকায় লেখা 'পিঞ্জর' গল্পের মাধ্যমে রতন ভট্টাচার্য লেখক হিসাবে পরিচিতি পান ঠিকই; কিন্তু 'পিঞ্জর' রতনের প্রথম গল্প নয়। এই গল্প প্রকাশের প্রায় চার-পাঁচ বছর পূর্বে ১৯৫৩-৫৪ সাল নাগাদ হাওড়া জেলার সালকিয়ার একটি সাহিত্য আড্ডাকে কেন্দ্র করে রতন ভট্টাচার্যের সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত ঘটেছিল। তৎকালীন সি পি আই কর্মী এবং কবি গৌর পালের বাড়িতে প্রতি শনিবার করে আয়োজিত সেই সাহিত্য আসরে কুড়ি-একুশ বছরের যুবক রতন প্রথম গল্প 'কোট' পড়েছিলেন বলে জানা যায়।[৪] তবে এই গল্পটি এখনও পর্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয়নি। রতন ভট্টাচার্যের প্রথম প্রকাশিত গল্পের নাম 'নগ্ন বসন্ত'। কার্তিক ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ (১৯৫৭)-এ গোপাল হালদার এবং মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকার ২৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায় এটি প্রাকাশিত হয়েছিল। এরপর ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত 'অমৃত', 'আনন্দবাজার', 'ঈগল', 'উল্টোরথ', 'কলেজ স্ট্রীট', 'কোমল দূর্বা', 'জনমন জনমত', 'তথ্যকেন্দ্র', 'দেশ', 'দক্ষিণীবার্তা', 'নহবত', 'পরিচয়', 'ফসল', 'বর্তমান', 'মহানগর', 'যুগান্তর', 'শিল্প ও সংস্কৃতি', 'শিলাদিত্য', 'সুকন্যা' ইত্যাদি খ্যাত-অখ্যাত পত্রিকায় রতন ভট্টাচার্যের শতাধিক গল্প প্রকাশ পায়।[৫] ছোটগল্প ছাড়াও তিনি লিখেছেন উপন্যাস, কিশোর গল্প-উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনি এবং নিবন্ধ। কিন্তু এখানে উল্লেখ্য, রতন ভট্টাচার্যের এই সাহিত্য চর্চা ধারাবাহিক বা নিরবচ্ছিন্ন ছিল না। কিছুটা স্বভাবগত উদাসীনতা থেকে এবং লেখাকে ঠিক পেশাদারি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গ্রহণ না করার ফলে লেখার জগৎ থেকে স্বেচ্ছায় একাধিকবার সরে এসেছিলেন তিনি।[৬] ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত আনুমানিক উনিশটি ছোটগল্প লেখার পর ১৯৬৪ সাল থেকে প্রায় পনেরো বছর ব্যক্তি শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের অন্তরালে আত্মগোপন করেছিলেন লেখক রতন ভট্টাচার্য (লেখকের প্রকৃত নাম শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য; রতন তাঁর ডাকনাম। লেখালেখির ক্ষেত্রে নিজের ডাকনামটিকে ব্যবহার করেছিলেন তিনি)। পনেরো বছর পর ১৯৭৮ সালে 'তৃতীয় মহাযুদ্ধ' ('দেশ', ২০ মে ১৯৭৮) গল্পের মাধ্যমে লেখার জগতে প্রত্যাবর্তন করেন রতন। লেখালেখি থেকে এই পনেরো বছরের বিরতির ফলে রতন ভট্টাচার্যের সাহিত্য জীবনে স্পষ্টত দুটি পর্ব (প্রথম পর্ব: ১৯৫৭-১৯৬৩ এবং দ্বিতীয় পর্ব: ১৯৭৮-১৯৯৯) পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যে রতনের প্রথম পর্বের অধিকাংশ ছোটগল্পে একাকী, নিঃসঙ্গ মানুষের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রথম পর্যায়ের এমনই দুটি গল্প 'নগ্ন বসন্ত' ('পরিচয়', ১৯৫৭) এবং 'কৃষ্ণকীর্তন' ('দেশ', ২১ জানুয়ারি ১৯৬১) আমাদের বক্ষ্যমাণ আলোচনার বিষয়। পূর্বোক্ত গল্প দুটির প্রধান দুই চরিত্র যথাক্রমে মাধবী এবং রানী বৌদির একাকিত্বের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য এবং বিভেদের নিরিখে বর্তমান আলোচনার জন্য আমরা এই দুটি গল্পকে নির্বাচন করেছি। এবারে সেই আলোচনায় প্রবেশ করা যায়।

ছাপার অক্ষরে রতন ভট্টাচার্যের প্রথম প্রকাশিত লেখার নাম 'নগ্ন বসন্ত' ('পরিচয়', কার্তিক ১৩৬৪)। মাধবী নামের তেইশ উত্তীর্ণ, 'অশিক্ষিত' এক যুবতী নারীর অবিবাহজনিত নিঃসঙ্গতাবোধ 'নগ্ন বসন্ত' গল্পের বিষয়। এই মাধবীর পাঠানো একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে গল্প আরম্ভ হয় এভাবে— 'এ চিঠি সে-ই লিখেছে। সে। মাধবী। কল্যাণ একটা করে

সিঁড়ি নামছে আর ভাবছে, সত্যি সে-ই লিখেছে কিনা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আরও একবার চিঠিটা পড়ল কল্যাণ, আশ্চর্য! মাধবীই লিখেছে।'[৭] ছোট ছোট বাক্য বিন্যাসের মধ্য দিয়ে গল্পের বুনন এখানে লক্ষণীয়। দেখা যাচ্ছে, কোথাও কোথাও একটি-দুটি শব্দেও বাক্য সম্পূর্ণ করেছেন গল্পকার। এর পরেও গল্পে এভাবে বাক্যবিনাসের পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। দেখা যায়, মাধবী চিঠি পাঠিয়েছে কল্যাণকে। গল্প সূত্রে জানতে পারি, মাধবী কল্যাণের মামাতো বোন, কল্যাণকে সে এখানে কখনো 'ছোড়দা' কখনো 'কালোদা' বলে সম্বোধন করেছে। পরে দেখা যাবে সম্পর্কের এই 'সংস্কার' এবং কামনার সংরাগ কীভাবে দুজন পরিণত নারী-পুরুষের মধ্যে টানাপোড়েন তৈরি করে, ক্রমশ চূড়ান্ত মুহূর্তে পৌঁছে গল্পকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে।

বেলা চারটে পাঁচ থেকে সাড়ে ছয়— মাত্র দুই ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট আলোচ্য গল্পের কালসীমা। কিন্তু গল্পকার এই সীমিতি পরিসরের মধ্যে সময়কে এমন সুকৌশলে বিন্যস্ত করেছেন যে তা পাঠকচিত্তে সময়ের এক বিস্তৃত, অপেক্ষাকৃত ব্যাপকতর সংবেদন জাগিয়ে তোলে। বিষয়টি আলোচনাসাপেক্ষ। গল্পে দেখি, মাধবীর পাঠানো চিঠিটা 'একটা আলো হয়ে সমস্ত অতীতটাই তুলে ধরেছে কল্যাণের সামনে। প্রথম দিন। দ্বিতীয় দিন। তারপর আর হিসেব নেই। এক, দুই করে অনেক বেহিসেবী দিনের অতীত।'[৮] বস্তুত মাধবীর পাঠানো চিঠি পড়ে কল্যাণের মনে পড়ে যায় তার বিগত কয়েক দিন যাবৎ মাধবীর জামতলা লেনের বেলেঘাটার বাড়িতে যাতায়াতের স্মৃতি। এইভাবে মুখ্যত কল্যাণের স্মৃতিকে আশ্রয় করে গল্পকার কাহিনিকে কখনো বর্তমান থেকে অতীত, কখনো অতীত থেকে বর্তমান সময়ে গতায়াত করিয়েছেন। অর্থাৎ সময়ের এক 'বিপর্যস্তক্রম (anachronies)'[৯] এবং সেই ক্রমের দুই ধরনের পদ্ধতি— 'পশ্চাৎ-উদ্‌ভাস (flash back) ও পূর্ব-উদ্‌ভাস (flash forward)'[১০]-কে আশ্রয় করে মাধবীর নিঃসঙ্গ অন্তর্লোককে উন্মোচিত করেছেন রতন ভট্টাচার্য।

মাধবীর পিতা, যিনি সম্পর্কে কল্যাণের বড়োমামা, তাঁর অনুপস্থিতিতে ('খগেনবাবু ছিলেন সাধারণ একজন মধ্যবিত্ত মানুষ, প্রায়ই ফিরতেন রাত করে।')[১১] বেশ কয়েক দিন ধরে কল্যাণের বেলেঘাটায় নিয়মিত যাতায়াতের ফলে তার এবং মাধবীর মধ্যে নৈকট্য তৈরি হয়। 'আজ থেকে পনেরো দিন আগে পর্যন্ত প্রতিদিন'[১২] বিকেলে কল্যাণকে মাধবীর চা করে দেওয়া, কোনওদিন গা ধুয়ে বৈকালিক প্রসাধনের পর মাধবীকে দেখে কল্যাণের মুগ্ধতা, আবার কোনওদিন তার 'অগোছালো' চুল মাধবী নিজে হাতে চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে দেওয়ার সময় চিরুনির টানে চকিতে উভয়ের শরীর স্পর্শ করে যাওয়া, কিংবা কল্যাণের মাথা ধরলে তার মাথাটা মাধবীর নিজের কোলে রেখে টিপে দেওয়ার মধ্য দিয়ে তারা পরস্পরের কাছে আসে। তবে এই নৈকট্যের ফলে পারস্পরিক তীব্র আকর্ষণ অনুভব করলেও দাদা-বোন সম্পর্কের সংস্কারবশত তাদের কামনাকে অবদমন করতে হয়। 'কিন্তু যৌবন অনন্যসাধারণ। তাই যৌবন বিদ্রোহ করে। আর যখন করে, তখন না থাকে সঙ্কোচ, না থাকে সংস্কার।'[১৩]

অবিবাহিত এক যুবতী নারী— মাধবীর নির্জন বাড়িতে প্রত্যহ কল্যাণের যাতায়াতের ফলে তারা সম্পর্কে দাদা-বোন জানা সত্ত্বেও একটা সময় পর মাধবীর পাড়ায় তাদের নিয়ে গুঞ্জন, আলোচনা আরম্ভ হয়। বাড়ি এসে কেউ কেউ সাবধানও করে যায় মাধবীকে। কিন্তু মাধবী এ সব 'গ্রাহ্য' করে না। আসলে গ্রাহ্য করলে মাধবীর চলবে না বলেই সে এসব উপেক্ষা করে যায় অবলীলায়। তবে প্রতিবেশীর কৌতূহল, তাদের অযাচিত উপদেশকে মাধবী অগ্রাহ্য করলেও, যেন কল্যাণকে পরখ করার জন্যই একদিন সে বলে, 'সংস্কার আর সংস্কার। ...আর ছোড়দা তুই, তুইও একটি সেই সংস্কার।'[১৪] গল্পে দেখি, কল্যাণের প্রতি মাধবীর ব্যবহার প্রথমাবধি 'সমস্ত রকম সঙ্কোচমুক্ত।'[১৫] একজন মেয়ের, হোক সে সম্পর্কে তার বোন, কিন্তু বারো বছরের পারিবারিক কলহের কারণে তাদের মধ্যে সম্পর্ক এবং অপরিচয়ের যে ব্যবধান তৈরি হয়, সেক্ষেত্রে তার সঙ্গে মাধবীর নিঃসঙ্কোচ-দ্বিধাহীন মেলামেশায় কল্যাণ প্রথমে অবাক হলেও, পরে দীর্ঘদিনের সাহচর্যে এর কারণ জানতে পারে সে। আসলে কল্যাণ বুঝতে পারে মাধবী তার নিঃসঙ্গ যৌবনের অবলম্বন করতে চেয়েছে তাকে। সর্বজ্ঞ কথক-এর নিরীক্ষণবিন্দু থেকে বর্ণিত আলোচ্য গল্পে দেখি, প্রায়শই মাধবী কল্যাণকে নিজের বয়স জিগ্যেস করত— 'কালোদা, বলো তো আমার বয়স কত?'[১৬] তারপর কল্যাণের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে নিজেই বলত, 'গত শ্রাবণে তেইশে পড়েছি।

এখন শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন— তাহলে হল তেইশ বছর তিন মাস।'[১৭] নিজের বয়স বলার সময় মাধবীর 'দীর্ঘশ্বাস' ফেলা মনোযোগী পাঠকের নজরে পড়ে থাকবে। বস্তুত 'প্রায়ই' মাধবীর নিজের বয়স জিজ্ঞাসা করা, তার দীর্ঘশ্বাস, বছর-মাস ধরে নিজের বয়সের সানুপুঙ্খ হিসাব রাখা কিংবা এই নিয়ে কল্যাণ মজা করতে চাইলেও মাধবীর প্রথমে 'গম্ভীর' হয়ে যাওয়া, পরে 'চাপা কান্নায়' ভার হয়ে আসা কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে যৌবনা এক নারীর একাকিত্ব, নিঃসঙ্গ হৃদয়ের বেদনা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তবে মাধবীর নিঃসঙ্গতা কেবল আজকের নয়, অতীতেও একজন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে মাধবীকে একা করে গেছে। মুখ্যত সর্বজ্ঞ কথকের বয়ানে বিবৃত 'নগ্ন বসন্ত' গল্পে মাধবীর নিজস্ব একটি গল্পও রয়েছে। সে গল্প তার অতীতের, সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণকে একটু সীমিত করে যা তার নিজস্ব জবানিতে ব্যাখ্যাত হয়েছে। মাধবীর গল্প থেকে জানা যায়, ওপার বাংলায় বসবাসকালীন (আলোচ্য গল্পের একেবারে প্রথমে একবার উল্লখিত হয়েছে মাধবী ও তার পরিবার 'রিফিউজি'[১৮]), যখন তার বয়স এগারো, তখন তেরো-চোদ্দো বছরের একটি ছেলে নিরঞ্জন তাকে ভালোবাসত। কিন্তু রাগ, অভিমান, ভালোবাসার মধ্য দিয়ে অগ্রসর তাদের সম্পর্কের এক বছরের মধ্যেই ভাঙন ঘটে ম্যাট্রিক পাশ করে নিরঞ্জন পড়াশোনার জন্য জেলা শহরে চলে গেলে। অবশ্য যাওয়ার দিনে মাধবীকে একদিন ঠিক ফিরে আসার কথা দিয়েছিল নিরঞ্জন, শেষপর্যন্ত যা রক্ষা করেনি সে। বস্তুত মাধবী তখন থেকেই একাকিত্ববোধে পীড়িত বলা যায়। তবে বর্তমানে মাধবীর এই নিঃসঙ্গতা এবং সেই নিঃসঙ্গতা থেকে তার কল্যাণকে, যে সম্পর্কে কিনা তার পিসতুতো ভাই অবলম্বন করতে চায় মাধবী— এই উপলব্ধিতে সম্পর্কের সংস্কারবশত 'নিদারুণ অস্বস্তিতে কান্না পেয়েছিল কল্যাণের। কল্যাণ কেঁদেছিল।'[১৯] তবে দীর্ঘদিনের সাহচর্য ও ঘনিষ্ঠতা এবং 'যৌবনের বিদ্রোহ'-এর কারণে এই সংস্কারকে একদিন জয় করে কল্যাণ। সেদিন মাধবী তার মামাতো বোন—এই পরিচয় অস্পষ্ট হয়ে গিয়ে কল্যাণের কাছে প্রতিভাত হয় মাধবী একজন নারী; যে নারীর অসম্পূর্ণ, অচরিতার্থ এক প্রেমের অতীত আছে, যে নারী যুবতী ও নিঃসঙ্গ এবং যার বিবাহ সম্বন্ধ পুনরায় ভেঙে যাওয়ায় সে আহত। গল্পে দেখি:

> সহসা সমস্ত স্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে বিপুল কান্নায় মাধবী মুখ লুকোল কল্যাণের কোলে। ভেঙে ভেঙে, ছেড়ে ছেড়ে বলল, ছোড়দা, তাহলে তুই এলি আবার! কেন এলি!
>
> কী বলবে কল্যাণ? কেন এল সে? এ সব প্রশ্নের জটিলতায় হারিয়ে গিয়ে কল্যাণ আবিষ্কার করল একটি মেয়ে তার কোলের ওপর মুখ রেখে কাঁদছে। সমস্ত বাড়ি নির্জন। এ ঘরে এখনো আলো জ্বলে নি। একথা মনে হতেই রক্তপ্রবাহে নিয়তির ইশারা চমকে চমকে উঠল।...ধীরে ধীরে উদ্দাম হয়ে উঠছিল রক্তের প্রবাহ! কেমন গা-ছম্‌ছম্‌ অন্ধকার। কোলের ওপর একটি মেয়ে। সেই মেয়েকে ভালোবাসি।[২০]

এই প্রথম মাধবীকে বোন ব্যতিরেক একজন 'মেয়ে' এবং সেই মেয়েকে সে ভালোবাসে তা উপলব্ধি করায় 'সেই মুহূর্তে সহসা দৃঢ় আবেগে কল্যাণ দুহাতে জড়িয়ে ধরল মাধবীকে। যন্ত্রণায় নিষ্পিষ্ট হল মাধবীর সমস্ত দেহ চৈতন্য।'[২১] কিন্তু এইবার মাধবী অনেক চেষ্টায় কল্যাণের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় সে তার বোন। অবশ্য এই বিপর্যয়ের পিছনে নিজেকেই দায়ী করে মাধবী, তবু তখনকার মতো নিজেকে সংযত করে কল্যাণকে তাদের বাড়িতে আর না আসার কথা বলে সে।

এরপর পনেরোদিন অতিক্রান্ত হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মাধবী যুবতী, মাধবী নিঃসঙ্গ, যে নিঃসঙ্গতা থেকে সে অবলম্বন করতে চেয়েছে কল্যাণকে। প্রসঙ্গত মনে পড়বে মাধবী কল্যাণকে বলেছিল, '...তুই না এলে আমি কী নিয়ে থাকব বল?'[২২] মাধবীর স্বরের আকুলতা এখানে লক্ষণীয়। 'আজ' পনেরোদিন পর মাধবী চিঠি লিখেছে কল্যাণকে। কল্যাণ এই চিঠির তাৎপর্য এবং মাধবীর আকুলতাকে অনুধাবন করতে পারে। যদিও গল্প প্রায় সমাপ্তিতে এসে পৌঁছালেও দেখা যাচ্ছে, গল্পকার এখনও স্পষ্ট করেননি, মাধবী চিঠিতে কী লিখেছে সে কথা। আসলে পাঠকের কৌতূহলকে গল্পের শেষপর্যন্ত ধরে রাখার জন্য এটি গল্পকারের এক সচেতন প্রয়াস বা কৌশল বলা যায়। যাইহোক, মাধবীর চিঠি পেয়ে তার কাছে যাওয়ার একটা কারণ পেয়ে যায় কল্যাণ। এবং এখন যেহেতু কল্যাণ জানে তার মাধবীর কাছে যাওয়াটা নিতান্ত দাদা-বোন সম্পর্কের নির্মল টানে নয়, তাই সে নিজের যাওয়াটাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য নিজস্ব একটা যুক্তি সাজায় এভাবে:

> ...মাধবী সেই মেয়ে যার জীবনে যৌবন এল, বসন্ত এল, কিন্তু সঙ্গী এল না। সঙ্গী আসে নি মাধবীর জীবনে। আর আসে নি বলেই তো তার জীবনে বসন্ত এমন নগ্ন। যৌবন একজনকে চায়। কল্যাণ না গিয়ে দাঁড়ালে মধবীর যৌবন যে-কোনো একজনকে খুঁজে নেবে। আর সেই প্রকাশ্য বিদ্রোহে মাধবী হবে কলঙ্কিত। কল্যাণের মনে হল, শুধু সমাজ নয়, মামাদের পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষার জন্যেও অন্তত তার যাওয়া প্রয়োজন। হয়তো পাঁচজনে পাঁচকথা বলবে, কিন্তু তেমন করে বলবে না যেমন করে বলত মাধবী সঙ্গী খুঁজতে পথে বেরুলে।[২৩]

দেখা যাচ্ছে, মাধবীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাদের বাড়ি যাওয়ার মধ্যে যে দ্বিধা বা অপরাধবোধ কাজ করেছে কল্যাণের মধ্যে, তা সংগোপন এবং অতিক্রমণের জন্যই মধবীর বাড়ি যাওয়ার কারণটিকে সে একটা কর্তব্য বলে মহিমান্বিত করতে চেয়েছে। পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, একদিকে কামনার সংরাগ অন্যদিকে সম্পর্কের সংস্কারের জন্য কল্যাণের যে বিবেক দংশন তার মধ্যস্থতা করতেই সে তার যাওয়াটাকে 'মামাদের পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষার' কর্তব্য পালন করা বলে মনকে ছদ্ম সান্ত্বনা দেওয়ার একটা চেষ্টা করেছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, মাধবীর আহ্বান উপেক্ষা করা কল্যাণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। রতন ভট্টাচার্য গল্প শেষ করেছেন এভাবে—'হ্যাঁ, কল্যাণ যাবে। ভারী আনন্দ হল কল্যাণের। কেমন প্রশান্ত হল সমস্ত অনুভূতি। সর্কুলার রোড পার হল সে। তারপর বেলেঘাটাগামী একটা বাসের নির্জনতম কোণে স্থান করে নিয়ে অদ্ভুত শান্তিতে নিশ্বাস নিল। এখন এই মুহূর্তে আর-একবার মাধবীর চিঠিটা পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। ...মাধবী লিখেছে। লিখেছে— কালোদা আসিস, আসবি তো?'[২৪] চিঠিতে লেখা এই কয়েকটি শব্দের মধ্য দিয়ে মাধবীর নিঃসঙ্গতা এবং সেই শূন্যতাকে অতিক্রমণের জন্য তার ব্যাকুলতা সহজেই প্রতিভাত হয়।

১৯৬১ সালের ২০ জানুয়ারি সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় রতন ভট্টাচার্যের 'কৃষ্ণকীর্তন' গল্পটি। পরবর্তীকালে সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত 'দেশ সুবর্ণজয়ন্তী গল্প সংকলন' (১৯৩৩-৮৩, 'আনন্দ পাবলিশার্স')-এ অন্তর্ভুক্ত হয় এই গল্প। রমেন ও রানী বৌদির পারস্পরিক আকর্ষণ ও পরকীয়া প্রেমের গল্প 'কৃষ্ণকীর্তন' 'তখনকার তরুণ পাঠকমহলে সাড়া তুলেছিল খুব' বলে জানিয়েছেন বিমল কর।[২৫] মূল কাহিনি আরম্ভের ছয় মাস আগে পর্যন্তও রমেনদের বাড়িতে ভাড়া থাকা রানী বৌদির জন্য রমেনের ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে কলকাতা থেকে কেতনপুর গ্রামে আসার ঘটনা দিয়ে গল্প আরম্ভ করেছেন রতন। এরপর কাহিনির অগ্রগতির সঙ্গে তিনি পরস্পর মুগ্ধ দুই নর-নারী রমেন ও রানী বৌদির মনস্তত্ত্বের রূপায়ণ ঘটিয়েছেন গল্পে। আলোচ্য গল্পে রমেন আবেগপ্রবণ এক রোমান্টিক তরুণ, যে কিছু কামনা নিয়ে তার রানী বৌদির কাছে এসেছে। অন্যদিকে 'ঠাণ্ডা, লম্বা চেহারার'[২৬] নরেনদার স্ত্রী রানী বৌদি দাম্পত্য জীবনে অসুখী, অতৃপ্ত এক নারী, যে রমেনের সান্নিধ্যে নিজের বিবাহিত জীবনের শূন্যতাকে পূরণ করতে চেয়েছে। তাদের ছয় মাসের বিচ্ছেদে রানী বৌদি নিজে ছয়বার কলকাতা গিয়ে রমেনের সঙ্গে দেখা করে এসেছে এবং চিঠি লিখেছে উনিশটি। রমেনের সঙ্গে দেখা করবার এই তাগিদ এবং তাকে প্রেরিত চিঠির সংখ্যাধিক্য থেকে রানী বৌদির বিবাহিত জীবনের নিঃসঙ্গতা ও রমেনের প্রতি তার আকর্ষণের দিকটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গল্পে দেখি, রমেনের বাড়ির সকলের খোঁজখবর নেওয়ার পর রানী বৌদি সোজাসুজি রমেনের চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার কোন খবর নেই? কোন নতুন খবর? ...আমি তো আর এখন তোমাদের নীচের তলায় থাকি না। তুমি কার বই এনে দাও। কার সঙ্গে গল্প কর। রুনু এখন তুমি কাকে ভালোবাসো?'[২৭] মজার ভঙ্গিতে কথা বললেও এই কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রানী বৌদির 'বিশ্রী আক্রোশ'[২৮] এবং ঈর্ষার দিকটি গোপন থাকে না পাঠকের কাছে। আবার রমেন একটু রাগ করলে রানী বৌদি যখন তাকে বলে, 'তুমি তবু রাগ কর। কিন্তু আর একজন? তার রাগ দুঃখ অনুরাগ কিছুই নেই। মাটির মানুষ। আমার কি দুঃখ তিনি বুঝতেই পারেন না। বেশ তো আছি। খাচ্ছি, বেড়াচ্ছি, ঘুমাচ্ছি'[২৯] তখন এই সংলাপের মধ্য দিয়ে রানী বৌদির বেদনা ও হতাশাই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। লক্ষণীয়, নরেনদার যেমন রাগ নেই, দুঃখ নেই তেমনি অনুরাগও কিন্তু নেই। স্বামীর এই অনুরাগের অভাবই তো আসলে রানী বৌদির বিবাহিত জীবনের অতৃপ্তি এবং সেই অতৃপ্তির বোধ থেকে সঞ্জাত তার নিঃসঙ্গতার কারণ। এখানে উল্লেখ্য, স্বামীর প্রতি রানী বৌদির 'আপনি' সম্বোধনের বিষয়টি, তা কোথাও যেন তাদের সম্পর্কের দূরত্বকেই নির্দেশিত করে। অন্যদিকে রানী বৌদি এবং রমেনের কথোপকথনের

মধ্য দিয়ে কলকাতায় তাদের একান্ত সময় যাপনের নানা টুকরো ছবি উঠে এসেছে গল্পে। যেমন, কলকাতায় বৃষ্টি হলে সেইসব দিনে তাদের অনেক রাত্রি পর্যন্ত গল্প করা কিংবা নির্জন ছাদে অন্ধকারে বসে গল্প করার সময় রানী বৌদির চুলে রমেনের হাত দেওয়া অথবা রমেনের বাড়ি ছেড়ে রানী বৌদির চলে আসার দিন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তাদের ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত থেকে প্রতিভাত হয় রানী বৌদি ও রমেনের সম্পর্কের রসায়ন। এভাবেই রতন ভট্টাচার্য 'কৃষ্ণকীর্তন' গল্পে পরকীয়া প্রেমকে বিষয় করে রানী বৌদির হতাশা, নিঃসঙ্গতাবোধ, তার ভিন্ন পুরুষ রমেনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, অপর নারী সংসর্গের অকারণ সন্দেহে ঈর্ষান্বিত হওয়া প্রভৃতি সামূহিক দিককে তুলে ধরে দাম্পত্য জীবনে অসুখী এক নারীর জটিল, নিঃসঙ্গ অন্তর্লোককে চিনিয়ে দিয়েছেন।

'কৃষ্ণকীর্তন' গল্পে মূলত একটি রাত্রির কাহিনি উপজীব্য হয়েছে। রতন ভট্টাচার্য সেই রাত্রির বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে— 'নরেনদা বাড়ি নেই। নরেনদা আজ ফিরবে না। বাইরে অবিশ্রাম বৃষ্টি। অন্ধকার। আমগাছে হাওয়ার মাতামাতি। খালের জলে ব্যাঙ ডাকছে। আর এত বড় প্রকাণ্ড বাড়িটায় কেবল রমেন আর রানী বৌদি।'[৩০] বর্ষণ ও বাসনামুখর এমন একটি প্রতিবেশে নরেনদা বাড়ি নেই শুনে প্রথমে চমক লাগে রমেনের এবং ভিতরে ভিতরে প্রবল উত্তেজনা অনুভব করে সে। পরে উত্তেজনা কমে এলে দেখি রমেনের মন এক 'সুখানুভূতিতে'[৩১] পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এরপর কিছুটা দুঃসাহসিকভাবেই রমেন রানী বৌদিকে রানী নামে সম্বোধন করে ওঠে। এক প্রেমমুগ্ধ তরুণ যে তার রানী বৌদির জন্যই কলকাতা থেকে এক পাড়া-গ্রাম কেতনপুরে ছুটে এসেছে, সেখানে হঠাৎ নরেনদার অনুপস্থিতির কথা শুনে রমেনের চমকিত হওয়া, উত্তেজিত হওয়া, এবং পরিশেষে সংরক্ত আবেগে দুঃসাহসী হয়ে ওঠা ইত্যাদির মধ্যে যে মানসিক প্রতিক্রিয়ার ক্রম-বিবর্তিত পরিণাম তা এককথায় অনবদ্য। কিন্তু রমেনের এমন সঘন আবেগময় মুহূর্তে গল্পে কিছুটা চমকপ্রদভাবে আবির্ভাব ঘটে বাড়িওয়ালি মাসীমার। গল্পে মাসীমার চেহারার যে বর্ণনা পাই তা এরকম— 'ঘরে ঢুকলেন একটি অদ্ভুত ছোট্ট মানুষ। মাসীমা। রানী বৌদির মাসীমা। ...মাসীমার গায়ের রঙ বিশ্রী কালো। যেন একরাশ অন্ধকার। মুখটা বুঝি কত কালের। কোন ভাবের ছায়া পড়ে না।'[৩২] এই মাসীমার কাছে রানী বৌদি রমেনের পরিচয় দেন তার মামাতো ভাই বলে। অর্থাৎ রানী বৌদি-রমেনের সম্পর্ক নিছক ভাড়াটে-মালিকের নয়; তারা পরস্পর আত্মীয়তার সূত্রেও সংবদ্ধ, যা আপাতভাবে তাদের আসামাজিক প্রেমকে ভিন্নতর মাত্রা দিয়েছে। গল্পে দেখি, অনেক আগে থেকে অন্তরালবর্তী মাসীমা অতন্দ্র প্রহরীর মতো রমেন ও রানী বৌদির গতিবিধির ওপর নজর রাখছিলেন। শুধু তাই নয়, রাত্রে খাওয়ার পর যখন তাদের একত্র শয়নের বিষয়টি একপ্রকার স্থির হয়ে গেছে, তখন মাসীমার তৎপরতায় ওপরের একটি ঘরে রমেনের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও উপায়হীনভাবে মাসীমার এই বন্দোবস্ততে সম্মত হতে হয় তাদের। কিন্তু দেখা যায়, মিলনোন্মুখ রমেন পরে রানী বৌদির কাছে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এক্ষেত্রে একইভাবে উৎসুক রানী বৌদিও সম্মতি জানায়। রানী বৌদির হাতে পাতা 'সুন্দর' বিছানায় একাকী শুয়ে এক অজানা যন্ত্রণায় দীর্ঘক্ষণ দীর্ণ হওয়ার পর একসময় নীচে যাওয়ার জন্য রমেন বাইরে বেরিয়ে আসে। কিন্তু এবারও মাসীমার উপস্থিতি ও বাধায় রমেনের অভিসার ব্যর্থ হয়। পরস্পর মুগ্ধ দুই নর-নারী যারা পরস্পরের জন্য একান্ত উন্মুখ এবং যেখানে পরিবেশও অনুকূল তার বিপ্রতীপে অবস্থান এই মাসীমার। ফলে গল্পের চরিত্রদের মধ্যে একটি 'ক্রাইসিস' বা টানাপোড়েন তৈরি হয়। একদিকে রমেন ও রানী বৌদির একান্ত সান্নিধ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে মাসীমার নজরদারি ও বাধাদান এবং পরিশেষে সমস্ত রাত্রি প্রবল উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রতীক্ষা সত্ত্বেও রমেন ও রানী বৌদির কামনার অচরিতার্থতা গল্পটিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে বলা যায়।

পরিশেষে বলতে হয়, প্রথম পর্বের দু'টি ছোটগল্প 'নগ্ন বসন্ত' এবং 'কৃষ্ণকীর্তন'-এ দু'জন নিঃসঙ্গ নারীর অন্তর্লোককে উন্মোচিত করেছেন রতন ভট্টাচার্য। 'নগ্ন বসন্ত'-এর তেইশ উত্তীর্ণ যুবতী নারী মাধবী যথাসময়ে বিবাহ না হওয়ার ফলে একাকিত্ববোধে পীড়িত হয়েছে। অন্যদিকে বিবাহ জীবনের অতৃপ্তি রানী বৌদির নিঃসঙ্গতার কারণ। দেখা যাচ্ছে, কারণ ভিন্ন হলেও এই নিঃসঙ্গতা থেকে মাধবী এবং রানী বৌদি এমন একটি সম্পর্কের দিকে অগ্রসর হয়েছে, যা আপাতদৃষ্টিতে অসামাজিক। 'নগ্ন বসন্ত'-এর মাধবী তার একাকিত্ব, নিঃসঙ্গতায় অবলম্বন করতে চেয়েছে পিসতুতো ভাই কল্যাণকে।

এবং 'কৃষ্ণকীর্তন' গল্পের রানী বৌদি আকৃষ্ট হয়েছে রমেনের প্রতি, যাদের বাড়িতে এক সময় স্বামীর সঙ্গে ভাড়া থাকত সে। শুধু তাই নয়; রমেন সম্পর্কে তার মামাতো ভাইও। এখানে উল্লেখ্য, 'নগ্ন বসন্ত' গল্পে সম্পর্কের সংস্কার মাধবী এবং কল্যাণের মধ্যে বেশ কিছুটা সময় যাবৎ ক্রিয়াশীল ছিল, যা অতিক্রম করতে সময় লাগে তাদের। অপরপক্ষে 'কৃষ্ণকীর্তন' গল্পে রানী বৌদি এবং রমেনের মধ্যে সম্পর্কের সংস্কারবশত কোনও দ্বিধা পরিলক্ষিত হয় না। তবে দু'ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, গল্পের চরিত্র-পাত্ররা (মাধবী ও কল্যাণ এবং রানী বৌদি ও রমেন) পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট, একান্ত উন্মুখ হলেও তাদের সংরক্ত কামনা সমাজ এবং সমাজ নির্মিত সম্পর্কের সংস্কারের কারণে চরিতার্থ হতে পারেনি। 'নগ্ন বসন্ত' গল্পে যেখানে দাদা-বোনের সম্পর্কের সংস্কার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে 'কৃষ্ণকীর্তন'-এ মাসীমা, যিনি আসলে সমাজ-এরই প্রতীকী রূপ বাধ সেধেছেন। ফলে দুটি গল্পই হয়ে উঠেছে দুই নিঃসঙ্গ নারীর অচরিতার্থ প্রণয়ের এক মর্মন্তুদ আখ্যান।

সূত্র নির্দেশ:

১. ভট্টাচার্য, রতন, (১৯৯০), *রতন ভট্টাচার্যের গল্প*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, (ব্লার্ব দ্র.)।
২. চট্টোপাধ্যায়, বিলাস, (১৪১৬ ব.), সঙ্গ-নিসঙ্গতায় নাগরিক বাউল, বসু, অরণি, (সম্পা.), *উলুখড়*, দশম সংকলন, গ্রীষ্ম সংখ্যা, পৃ. ২৪।
৩. কর, বিমল, (১৩৯২ ব.), *আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা*, করুণা প্রকাশনী, পৃ. ৫৪।
৪. চট্টোপাধ্যায়, বিলাস, (১৪১৬ ব.), সঙ্গ-নিসঙ্গতায় নাগরিক বাউল, বসু, অরণি, (সম্পা.), *উলুখড়*, দশম সংকলন, গ্রীষ্ম সংখ্যা, পৃ. ২২।
৫. রায়, তরুণকান্তি, (১৯৯৬), রতন ভট্টাচার্যের আধুনিকতা, শাসমল, বীরেন, (সম্পা.), *তীব্র কুঠার*, খণ্ড ২, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৯৫।
৬. 'মাঝখানে অনেকদিন চলে গেল। খানিকটা উদাসীনতা আছে। এটা হতে পারে যে লেখার ব্যাপারটাকে সেভাবে গুরুত্ব দিয়ে ভাবলে হয়ত অন্যরকম হত। ...এটা সময়ের ব্যাপার। একটা সময়ে খুব আগ্রহ ছিল। পরবর্তীকালে আর আগ্রহ থাকল না।' ভট্টাচার্য, রতন, (১৪১০ ব.), দ্র. যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়..., সরকার, আনন্দ, সরকার, কুমার, কল্যাণ, (সম্পা.), *ধী*, নববর্ষ সংখ্যা, পৃ. ৪৬-৪৭।
৭. ভট্টাচার্য, রতন, (১৩৬৪ ব.), নগ্ন বসন্ত, হালদার, গোপাল, এবং চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ, (সম্পা.), *পরিচয়*, ২৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৩৮৯।
৮. *তদেব*, পৃ. ৩৮৯-৩৯০।
৯. Genette, Gerard, দ্র. *আখ্যানতত্ত্ব*, দাস, অমিতাভ, (২০১৪), দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৪১।
১০. দাস, অমিতাভ, (২০১৪), *আখ্যানতত্ত্ব*, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ৪১।
১১. ভট্টাচার্য, রতন, (১৩৬৪), নগ্ন বসন্ত, হালদার, গোপাল, এবং চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ, (সম্পা.), *পরিচয়*, ২৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৩৯৪।
১২. *তদেব*, পৃ. ৩৯২।
১৩. *তদেব*, পৃ. ৩৯৬।
১৪. *তদেব।*
১৫. *তদেব*, পৃ. ৩৯১।
১৬. *তদেব।*
১৭. *তদেব।*
১৮. ভট্টাচার্য, রতন, (১৩৬৪ ব.), নগ্ন বসন্ত, হালদার, গোপাল, এবং চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ, (সম্পা.), *পরিচয়*, ২৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৩৮৯।
১৯. *তদেব*, পৃ. ৩৯১।
২০. *তদেব*, পৃ. ৩৯৮-৪০০।

২১. *তদেব*, পৃ. ৪০০।
২২. *তদেব*, পৃ. ৩৯৭।
২৩. *তদেব*, পৃ. ৪০১।
২৪. *তদেব।*
২৫. কর, বিমল, (১৩৯২ ব.), *আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা*, করুণা প্রকাশনী, পৃ. ৫৪।
২৬. ভট্টাচার্য, রতন, (১৩৬৭ ব.), কৃষ্ণকীর্তন, *সাপ্তাহিক দেশ*, ২৮ বর্ষ, সংখ্যা ১২, পৃ. ৯২৫।
২৭. *তদেব*, পৃ. ৯২৬।
২৮. *তদেব।*
২৯. *তদেব*, পৃ. ৯২৯।
৩০. *তদেব*, পৃ. ৯২৬-৯২৭।
৩১. *তদেব*, পৃ. ৯২৭।
৩২. *তদেব।*